সূচিপত্র

আমাদের উদ্দেশ্য	**৯**
ইসলাম : প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শ মানদণ্ড	১০
দুনিয়াবি লাভ-লোকসান সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী	১২
হারাম মানেই ক্ষতিকর	১৬
পারিবারের সাফল্য থেকে সামাজিক সমৃদ্ধি	১৭
পরিপক্বতা আসে ধীরে ধীরে	১৮
বদলে যাক আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি	১৯
পরিবার ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ	২৩
একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য	২৫
ঠিক-বেঠিকের দোলাচলে	২৭
ভুল ব্যাখ্যায় মূল কথার বিকৃতি	৩০
নেতিবাচক চিন্তা বয়ে আনে অকল্যাণ	৩১
মূল্যবোধের গুরুত্ব	**৩৪**
বিশুদ্ধ নিয়ত এবং আত্মশুদ্ধি	৩৭
গুজব ছড়াব না, গুজবে কান দেবো না	৪০
নফল ইবাদত হৃদয়ে প্রশান্তি আনে	৪১

সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ৪৭
হালাল পন্থায় জীবিকা নির্বাহ ৪৯
সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে দৃঢ়তা ৫২
অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ ৫৫
নিয়মনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৬০
কথা বলার দক্ষতা ৬২

আমাদের যত সম্পর্ক ৬৬
অন্যের সাহায্যের আশায় বসে থেকো না ৬৮
নিজের ভুল স্বীকার করা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা ৭১
পরিবার গঠনের নেপথ্যে যারা ৭২
অন্যের অক্ষমতা ও দোষত্রুটি ক্ষমা করা ৭৪
শিক্ষা ও চর্চার ধারাবাহিকতা ৮০
ভালোবাসার সাথে সমালোচনার মিশেল ৮১

আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ৮৪
আমাদের সন্তানরা দায়িত্ব নিতে শিখুক ৮৫
সফল পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা ৯০
একটি ভালো পরিবেশের গুরুত্ব ৯২
আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা ১০০

সুখী পরিবার নির্মাণের রূপরেখা ১০২
বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ১০২

আমাদের সন্তানরা দায়িত্ব নিতে শিখুক

প্রাথমিকভাবে যেকোনো পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। অনেক সময় কোনো ধরনের প্রস্তুতি ও সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই মানুষ এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পায়। আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান সমাজের বিশেষ কোনো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক। কোনো ভালো পেশায় জীবিকা নির্বাহ করুক। সুন্দরভাবে জীবনযাপন করুক। আমাদের এই চাওয়ায় পূর্ণতা আনতে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না। তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ আশ্রয়, জামাকাপড় এবং নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগের মতো প্রাথমিক কিছু চাহিদার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোলেই তাদের পছন্দমতো কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। এর সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সব পরামর্শ দেওয়া ও কাউন্সিলিং করানোই তখন এদের জন্য যথেষ্ট।

মানুষের মতো মহান আল্লাহ তাআলা পশুপাখিদেরও সন্তানদের যত্নআত্তি করার সক্ষমতা দিয়েছেন। মায়ের সঙ্গ ছাড়ার আগ পর্যন্ত প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি নিয়ে পশুপাখিও তাদের সন্তানদের যত্ন নেয়। আমরা যদি চাই আমাদের সন্তান মহান আল্লাহর আনুগত্য ও সততার সাথে সম্ভাবনাময় একটি পরিবার গঠন করুক, তাহলে বাস্তবিক অর্থেই আমাদের বেশ পরিশ্রম করা দরকার। আমাদের খানিক প্রচেষ্টার কারণেই হয়তো তারা শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তাদের সহযোদ্ধাদের ছাপিয়ে উঠবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। আমরা যদি কঠিনতর দুরবস্থার সম্মুখীনও হই, তবু কোনোভাবেই তাদের ওপর হাল ছাড়া যাবে না। এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের একটি নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকার। আমাদের বাবারা যেভাবে আমাদের যত্ন নিয়েছেন, তেমনি আমাদের ছেলেমেয়েরাও তাদের সন্তানদের জন্য ভবিষ্যতে ঠিক একই কাজ করবে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের ছাড় দেওয়া চলবে না। সন্তান-লালনপালনের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পথই তৈরি করা হয়েছে। এই পথ অনুসরণ করেই আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ভবিষ্যৎ-চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে পারব।

সন্তানদের ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে সম্ভাব্য কিছু উপায়—

» এই পৃথিবী আমাদের জন্য একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে আমরা বিভিন্নভাবে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হই। একের পর এক চ্যালেঞ্জ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি

হই। আমরা জালিম ও মাজলুমদের দেখতে পাই। কিছু মানুষকে অন্যের ওপর আগ্রাসন চালাতেও দেখা যায়। এখানেই আবার প্রেম-ভালোবাসার আদানপ্রদান; একে অপরের মধ্যে সুখ-দুঃখের বিনিময়। কখনো আমরা সুখের ভেলায় ভাসি, কখনো আবার ডুবে থাকি দুঃখের সাগরে। কখনো সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত, কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত। মুখোমুখি হই তীব্র সাহসী বীরপুরুষের, আবার দেখা মেলে কাঠখোট্টা নীরস লোকের সাথে। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরাই হয়ে উঠি জোরালো কণ্ঠের দৃপ্ত প্রতিবাদী অগ্রনায়ক। এমনই এক প্রকৃতিতে মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন। তাঁর তৈরি করা পন্থা এবং ঐতিহ্যই আমাদের জীবন পরিচালনা করছে। এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন কেমন হবে, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান সন্তানদের কাছে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।

একদিন এক বাবা তার সন্তানদের তার ছেলেবেলার গল্প শোনাচ্ছিলেন, 'ছোটবেলায় আমরা খুব গরিব ছিলাম। আমার বাবা অন্যের অধীনে কাজ করতেন। শীতকালে বাবার কোনো কাজ থাকত না। প্রায়ই আমরা তিনবেলার বদলে দুবেলা খাবার পেতাম। একটি জামা গায়ে দিয়ে আমি দিনের পর দিন পার করে দিতাম। যখন সেটা খুব বেশি ময়লা হয়ে যেত, তখন সেটা ধুয়ে দিতাম। সেদিন আমি আর ঘর থেকে বেরোতাম না। শীতকালে ধার-দেনা করে বাবা সংসার চালাতেন। এরপর সেই ঋণ শোধ করতে করতে আরেক শীত চলে আসত। এভাবেই চলত আমাদের সংসার। কষ্টের বেড়াজালে বন্দি ছিলাম আমরা।'

বাবার এই গল্প শুনে তো এক কন্যা প্রায় কান্নাই জুড়ে দিলো। অবস্থা বেগতিক দেখে বাবা সেখানেই গল্প থামিয়ে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বড় ছেলের একটা প্রশ্ন শুনে তিনি আবার গল্প শুরু করলেন। বড় ছেলের প্রশ্ন ছিল, 'আচ্ছা বাবা, এত অভাবের মধ্যেও তুমি কীভাবে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করলে!' বাবা উত্তর দিলেন, 'কোনো দুঃখ-কষ্টই কখনো চিরস্থায়ী হয় না। আল্লাহ তাআলা সব কষ্টের শেষে সুখ লিখে রেখেছেন। একটা সময়ে দাদুর সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে আমার বাবা বেশ বড় একটি অংশ পান। সেখান থেকে অর্থ গুছিয়ে নিয়ে বাবা ছোট্ট একটি ব্যবসা শুরু করেন। জীবন তখন নতুন দিকে মোড় নিল। আর আমাদের কষ্টের দিনগুলোও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল।'

সব শুনে আরেক সন্তান প্রশ্ন করল, 'বাবা, তুমি এত কষ্ট আর অসুবিধার মধ্যে

দিয়ে গেছ! কীভাবে পেরেছ এগুলো সামলে নিতে?' জবাবে বাবা বললেন, 'তখন আমাদের মতো হতদরিদ্র মানুষগুলোর জন্য এটা খুব সাধারণ ঘটনা ছিল। তাই তারা একে অন্যকে সাহায্য করত। আমরাও মানুষের কাছে অনেক সাহায্য-সহানুভূতি পেয়েছি। কষ্ট-দুর্দশার প্রভাব কমাতে এগুলোই তো যথেষ্ট। আমার মনে হচ্ছে আজকের গল্প এই পর্যন্তই থাকুক। এই বিশাল গল্প শেষ করতে আমরা আবার আরেকদিন বসব।'

» চারিত্রিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থেকেই মানুষে মানুষে তফাত। মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক দিক ও স্বভাব সম্পর্কে আমাদের সন্তানদের অবগত করতে হবে। তাদের জানাতে হবে—প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা মনোভাব থাকে। প্রতিটি মানুষের স্বভাবেই আছে ভিন্নতা। একইরকম চিন্তা-চেতনা ও মনোভাবের দুজন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। দুজন মানুষের একই রকম ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অথবা একই পরিস্থিতিতে দুজনের আচরণ একই রকম হবে—এমন চিন্তা করা যায় না। বাবা-মায়েদের উচিত এই ভিন্নতার ধারণা সন্তানদের মধ্যে স্পষ্ট করা। এই পার্থক্যগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে গল্প, চিত্র বা সুন্দর উদাহরণের সাহায্যও বাবা-মা নিতে পারেন। যেকোনো ধরনের আলোচনার পর শিশুদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। সন্তানদের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাদের জন্য আলোচনা ও প্রশ্ন করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।

আরেকজন বাবা একবার তার সন্তানদের সাথে সমাজে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বসেন। তিনি বলেন, যাদের সাথে আমাদের বসবাস তাদের বুঝতে হবে এবং অন্যদেরও বুঝতে সাহায্য করতে হবে। এরপর তিনি সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেন, কারো পক্ষে সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষের বিচার করার মাপকাঠি আলাদা হওয়ায় সবাইকে সন্তুষ্ট করা কখনোই সম্ভব নয়।

কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো একটি কাজ সঠিক বলে মনে হলে তিনি সেই কাজটি স্বাধীনভাবে করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা অন্যদের বোঝাতে হবে। তখন আর তাকে কেউ ভুল বুঝবে না।

একটি পুরোনো গল্প দিয়েই সন্তানদের কাছে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন তিনি—

'এক লোক তার কিশোর ছেলেকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছিল।

তারা যখন নতুন একটি গ্রামে প্রবেশ করল, বাবা তখন ঘোড়ার ওপর বসে ছিল আর ছেলেটি ঘোড়ার সাথে সাথে হাঁটছিল। এই দৃশ্য দেখে গ্রামের লোকেরা বলল, 'এই লোকের তো দেখি সন্তানের প্রতি কোনো মায়া-দয়া নেই! ছেলেকে তো তার সাথেই নিতে পারত। সে কেন ছেলেকে ঘোড়ায় চড়াচ্ছে না? একদম পাষাণ লোকটা!' এই কথা শুনে ছেলেটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

এরপর তারা অন্য একটি গ্রামে গেল। সেখানকার লোকজন বলাবলি করতে লাগল, 'এরা তো দেখি ঘোড়াটিকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। এদের একজনের উচিত ঘোড়া থেকে নেমে যাওয়া।' এবার বাবা ঘোড়া থেকে নেমে গেল। আর ছেলে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল। এভাবেই তারা চলতে লাগল।

কিছুদূর যাওয়ার পর তারা শুনতে পেল, 'ছেলেটি তো ভীষণ বেদায়ব! বাবার প্রতি কোনো সম্মান নেই। বাবা যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে আর ছেলে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে! দিনদিন ভক্তি-শ্রদ্ধা সব যেন উঠে যাচ্ছে।' গ্রামবাসীর কথা শুনে দুজনেই ঘোড়া থেকে নেম গেল। ঘোড়ার রশি ধরে তারা হেঁটে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে নতুন গ্রামে প্রবেশ করল তারা। হঠাৎ এক বুড়ো চাচা তাদেরকে বলতে শুরু করল, 'কী রে বাপু, তোমরা এত বোকা কেন? ঘোড়া থাকতে কেউ হেঁটে হেঁটে যায় নাকি?'

গল্প থামিয়ে বাবা এখন সন্তানদের প্রশ্ন করলেন, 'বলো তো ঘোড়ার মালিক এখন তার ঘোড়াটি নিয়ে কী করবে?' তার বড় ছেলে জবাব দিলো, 'ঘোড়াটিকে এখন শুধু মাথায় করে বয়ে নেওয়াই বাকি আছে।' তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। বাবা বললেন, 'দুনিয়ার সব মানুষকে খুশি করা আসলে কোনোদিনও সম্ভব নয়।'

গল্পটি বহুল প্রচলিত হলেও এর শিক্ষাটি বাচ্চাদের মনে চমৎকারভাবে গেঁথে দিলেন বাবা।

সন্তানদের তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে বাবা-মাকে হতে হবে কৌশলী এবং জীবন ও যুগ সম্পর্কে সদা সচেতন।

আমরা কেউই আমাদের ভবিষ্যৎ জানি না। মহান আল্লাহ ছাড়া আর সবার কাছেই ভবিষ্যৎ গুপ্ত। তবে ভবিষ্যৎ হলো আমাদের বর্তমানের কর্মফল। বর্তমান থেকেই জন্ম হয় ভবিষ্যতের। বর্তমান থেকেই রূপ নেয় ভবিষ্যৎ। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ

কখনো সহজতর হবে না। আর ভবিষ্যতে ব্যক্তিপ্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এজন্য নিজেকেই অপ্রীতিকর অবস্থা ও সাধনার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যের সাহায্যের আশায় থাকা উচিত নয়। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই প্রয়োজনের সময় সাহায্যের হাত বাড়ায় না।

ভবিষ্যতে বেশ চড়া মূল্যের বিনিময়েই কোনো কিছু অর্জন করতে হবে। কোনো কিছুই আর আমাদের জন্য সহজলভ্য থাকবে না। পরিবার-পরিজন ছেড়ে যেতে হবে দূর-দূরান্তের গন্তব্যে। পাড়ি দিতে হবে নতুন নতুন পথ। সহজলভ্য সুযোগ-সুবিধাগুলো এখন আর সহজেই কোনো এক জায়গায় পাওয়া সম্ভব নয়। এদের সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে খুঁজতে হবে বৈশ্বিক পরিসরে। ভবিষ্যতে ধর্ম প্রচারের সুযোগ খুব বেশি হবে। এর সাথে সাথে ঈমানি দৃঢ়তার গুরুত্বও বাড়বে।

ভবিষ্যতে কী হবে—প্রায়ই আমরা এমন দুশ্চিন্তা করি। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো দরকার নেই। বরং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে হবে। সাথে সাথে প্রস্তুত করতে হবে আমাদের সন্তানদেরও।

» ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের পরিবার হবে। তাদের কাঁধে থাকবে অনেক দায়িত্ব। তাই তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত। আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যে মেয়ে, আগামী দিনে সে মা হবে। মেয়েরা কীভাবে ভালো এবং সফল মা হতে পারে, তা নিয়ে মায়েদের উদ্‌বিগ্ন হওয়া উচিত। যদিও অনেক মা আছেন, যারা তাদের সর্বোচ্চটা দিয়েই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবু আমাদের উচিত বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাদের এই প্রচেষ্টার মানকে আরো উন্নত করে তোলা। আমরা একটি নতুন যুগে বাস করছি। এই আধুনিক যুগে অনেক পরিবর্তন দরকার। দরকার আধুনিকতার।

নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সবাইকে পরিবারের বিন্যাস ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানাতে হবে। এতে তারা পরিবারের গঠন-কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে। আত্মত্যাগ, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও সমঝোতার ভিত্তিতেই একটি পরিবার গঠিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ নয়; বরং বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করেই তারা তাদের সংসার গড়ে তুলে। নিজেদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকতে হবে। জানতে হবে

নিজের সঙ্গীকে। অন্য কারো জীবনসঙ্গীর সাথে মিল খুঁজলে হবে না।

কীভাবে নিজের পরিবার এবং স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচরণ করতে হয়, সেই আদব আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে। নিজের অধিকার আদায় করার পরামর্শ দিতে হবে। অনেকসময় স্বামী বা স্ত্রীর পরিবার-আত্মীয়স্বজন সঙ্গীর নিন্দা করে। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে। কীভাবে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায়, তা শেখানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল রাখতে হবে, যেন এমন পরিস্থিতিতে কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল না ধরে। তাদের জানা উচিত, এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই একে অন্যের পাশে থাকতে হবে। এ সময় একে অপরকে সহায়তা করা (অপরিহার্য) একটি দায়িত্ব।

সফল পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা

মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। আর এমন কিছু পরিবারের সমষ্টি হলো আমাদের সমাজ। ব্যক্তি-সাফল্যের চেয়ে পারিবারিক সাফল্য অনেক বেশি প্রয়োজন। আমাদের পরিবারে কিছু বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি থাকতেই পারে। নিঃসন্দেহে এটি পরিবারের জন্য ভালো এবং সম্মানজনক। তবে সামগ্রিকভাবে পরিবারের সাফল্য অর্জনের জন্য সকল সদস্যের একে অপরের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকা জরুরি। একটি সফল পরিবারের প্রভাব শুধু ওই পরিবারের সদস্যদের ওপরই পড়ে না। একটি পরিবারের সাফল্যের প্রভাব সমাজের ওপরও বিদ্যমান। ইসলামি সমাজের অধিকাংশ সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের মধ্যে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সফল পরিবারগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামের প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করতে বিরাটসংখ্যক সফল ব্যক্তিত্ব ও সফল পরিবার আজ বড্ড প্রয়োজন। তাই সামগ্রিকভাবে সফল পরিবার অনেক বেশি দরকারি।

সাফল্য অর্জনের জন্য একটি পরিবারের কাছে আমরা বেশ কিছু প্রত্যাশা রাখি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় এবার জানা যাক—

একটি মুসলিম পরিবার ও ইসলামি শরিয়তের বিধান—দুটি একই সুতোয় গাঁথা। একটি অপরটির সাথে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনই পারে একটি পরিবারকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে।

আসুন, এবার এমন একটা পরিবারের চিত্র দেখি, যে পরিবারটি ইসলামের সকল আবশ্যিক কাজগুলো খুব যত্নের সাথে করে থাকি। এই পরিবারের কোনো সদস্য সিগারেট বা মদ্যপানে আসক্ত নয়। সবার মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সবসময়ই তার অনুজদের প্রতি সদয় থাকেন। আর তরুণ অনুজ সদস্যরা তাদের বড়দের সম্মান করে চলে। এদের সবাই সুশৃঙ্খল এবং শান্ত। পড়ালেখায় এরা বেশ আন্তরিক ও পরিশ্রমী। এরা জ্ঞানপিপাসু; জ্ঞানের জন্য রয়েছে অগাধ ভালোবাসা।

একবার ভাবুন তো, কেমন হতে পারে এই পরিবারটির অবস্থা?

পরিবারটির যেমন বর্ণনা দেওয়া হলো এবং এর সদস্যরা যে পথ অনুসরণ করছে, এতে তাদের সাফল্য নিশ্চিত। তারা যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার যথার্থ পথ বেছে নিয়েছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর আনুগত্য হলো সফলতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অন্যদিকে অবাধ্যতার প্রতিটি মাধ্যম আমাদের ধ্বংস ও ব্যর্থতার পথে পরিচালিত করে। সফলতা ও ব্যর্থতার এই মাপকাঠি দিয়েই সবকিছু বিচার করা উচিত।

পরিবারের সুখ-সাফল্য ভাগাভাগি করে নিন

সব ধরনের সাফল্য ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করা উচিত। এতে উৎসাহ বাড়ে। একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টা থেকেই বোঝা যায়, সে তার পরিবার থেকে কীরূপ প্রশংসা ও মূল্যায়ন পায়। কোনো ব্যক্তি যখন সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি তার পরিবার থেকে অতীতেও কোনো কাজের জন্য প্রশংসিত হয়েছে। যথাযথ মূল্যায়ন পেয়েই আজ দ্বিগুণ উৎসাহে নতুনভাবে সফলতার জন্য চেষ্টা করছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মুসলিম পরিবারগুলো সবসময়ই তাদের সদস্যদের কৃতিত্ব উদ্‌যাপন করে। একজনের সাফল্যে পরিবারের সবাই একত্র হয়ে আনন্দ-উল্লাস করে। সবাই একত্র হয়ে সফল সদস্যের সাথে আনন্দ উদ্‌যাপন করে। একজন ব্যক্তির সাফল্য বা অর্জনের পরিমাণ যতই হোক না কেন, তিনি সবসময়ই চান প্রশংসা পেতে। শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছে গেলেও তিনি চাইবেন—তার ছোট ছোট অর্জনগুলোর জন্যও প্রশংসিত হতে। আমরা কিছুতেই এই চরম সত্যকে দূরে ঠেলে দিতে পারি না।

পারিবারিক সমস্যা সমাধানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নয়

একটি পরিবার নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে, এটাই স্বাভাবিক। পারিবারিক

সমস্যা নিয়ে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের দ্বারস্থ না হয়ে, নিজেদের মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান করা একটি চমৎকার গুণ। ওই পরিবার সর্বোত্তম, যারা নিজেদের ভেতরকার বিষয় নিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হয় না। পারিবারিক উৎকর্ষ অর্জনে এটি একটি অপরিহার্য মূল্যবোধ। যেকোনো ঘটনার তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজেই পরিবারটি এই উৎকর্ষ অর্জনে সক্ষম হবে। এই বিষয়ে বাবা-মায়ের পাশাপাশি পরিবারের বড় সন্তানদেরও অনেক দায়িত্ব আছে।

একটি ভালো পরিবেশের গুরুত্ব

আমাদের বসবাসের জন্য ভালো পরিবেশ বেছে নিতে হবে। একটি সভ্য পরিবেশে বসবাস মানেই বাকি সব পরিবেশের প্রতি আমাদের ঘৃণা প্রকাশ করা নয়। খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যে পরিবেশে বসবাস করছি, তা যেন অপরাধপ্রবণ না হয়। একটি দূষিত সমাজ হলো অপরাধ ও অনৈতিকতার কারখানা। মাদকাসক্তি এবং হতাশা থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে মানুষ সব ধরনের অনৈতিকতার সাথে বসবাস করছে। তারা নানান অপকর্মের সাথে জড়িত। কিছু এলাকার মানুষ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করাও তাদের জন্য কঠিন। কিছু কিছু এলাকায় আবার ভালো কোনো স্কুল নেই। বাচ্চাদের মেধাবিকাশ, চরিত্র ও স্বভাব গঠন এবং তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ঠিক এই কারণে সচেতন পরিবারগুলো জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে মফস্বল ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। অবশ্যই এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

আন্তরিকতার সাথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। অর্থাৎ, ছোটবড় সব বিষয়েই আমাদের নিবেদিত হতে হবে। মনোযোগের সাথে প্রতিটি বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করতে হবে।

এক বাবা জানতে পারলেন তার ছোট ছেলেটি রাস্তার খারাপ ছেলেদের সাথে মিশছে। এ কথা শুনে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাদের সাথে তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তারা কারা?' ছেলেটি বলল, 'ওদের কয়েকজন আমার এলাকার বন্ধু। আর বাকিরা আমার স্কুলের বন্ধু।' বন্ধুদের নাম ও পরিবার সম্পর্কে বাবা তার ছেলের কাছ থেকে জেনে নিলেন। এরপর তিনি সেই পরিবারগুলো সম্পর্কে মানুষের কাছ থেকে

তথ্য জোগাড় করেন। বাবা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করলেন—ছেলেগুলো আসলে কোন পরিবার থেকে এসেছে। সব রকম খোঁজ-খবর নেওয়া শেষ। এবার বাবা তার ছেলেকে জানিয়ে দিলেন, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যেই সে যেন এই খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে। তাদের সাথে যেন সব মেলামেশা বন্ধ করে দেয়।

এদিকে অসৎসঙ্গের কারণে কী কী ভয়াবহ পরিণাম জীবনে আসতে পারে, ছেলেটির মা খুব সুন্দরভাবে সেটা বুঝিয়ে বললেন। ছেলেটি পুরো ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে মা-বাবার কথা মেনে নিল। সন্তানের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে মা-বাবার ভূমিকা এমনটাই হওয়া উচিত।

এছাড়াও শিশুদের যেকোনো অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে শোনাটা খুব জরুরি। তাদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করতে হবে। তারা কী কী সমস্যা ও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে, সে ব্যাপারে জানার চেষ্টা থাকা চাই। শিশুরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। আর সব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও তাদের জানা নেই। অনেক সময় লজ্জায় বা ভয়ে তারা এসব সমস্যার কথা মা-বাবাকে বলতে পারে না। তাই সন্তানদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ রাখুন। সন্তান কোনো সমস্যা, দুশ্চিন্তা বা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কি না, তার খোঁজ রাখা বাবা-মায়েদের অবশ্যকর্তব্য।

এই সমস্যাগুলো সামলানোর জন্য সময়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব দিন। একটি আদর্শ পরিবার সময়ের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে। একজন কৃপণ ব্যক্তি টাকা অপচয় করছে এমন দৃশ্য যেমন বিরল, তেমনি একটি আদর্শ পরিবার সময়ের অপব্যবহার করবে এটাও অকল্পনীয়। সময়-ব্যবস্থাপনার (time management) মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার হাতের কাজটি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। খেলাধুলা, বিনোদন এবং ঘুমের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও তার হাতে থাকে। অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিটি কাজের জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ রেখে সময়-ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এতে করে তুচ্ছ বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করতে হয় না।

যে পরিবার যত ভালোভাবে সময় পরিচালনা করতে পারে, সেই পরিবারের সদস্যরা একে অপরের কাছ থেকে সহযোগিতা ও সহায়তার মাধ্যমে ততটাই বেশি উপকৃত হয়। পরিবারের সবাই প্রতিটি সম্পর্ককে যথেষ্ট সময় দিতে পারে।

এ কারণে তাদের মধ্যে অগাধ ভালোবাসা জন্মায়। দূরে গেলেও তাদের মধ্যে সুন্দর অনুভূতি বিরাজমান থাকে।

বর্তমানে একটি শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারকে আমরা একটি সফল পরিবার বলে গণ্য করি। যদিও আজকাল আর একেবারে অশিক্ষিত পরিবার খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে পরিবারের জন্য কেবল সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। বরং বিশেষ ও উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন। যে শিক্ষা কোনো সর্বজনীন শিক্ষার মানের সাথে অতুলনীয়। স্থানীয় কোনো মাপকাঠি দ্বারা এই শিক্ষার মূল্যায়ন করা হয় না।

প্রথমত, মা-বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন সন্তানের জ্ঞান অর্জনে সভ্যতা, অগ্রগতি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটে।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। মানসম্মত সঠিক শিক্ষা এখন বেশ ব্যয়বহুল হলেও তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত। নিম্নমানের শিক্ষা বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্যও এমন শিক্ষা বিপজ্জনক।

সুতরাং পরিবারগুলো সন্তানদের জ্ঞানার্জনের অনুমতি দেবে। সন্তানের জ্ঞানার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এটা বলার কারণ হচ্ছে, এমন অনেক বাবা-মা আছেন, যারা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সন্তানদের দূরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেন না। তারা দুরাচার ও বিভ্রান্তির ভয়ে সন্তানদের এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে চান না। অনৈতিকতা ও পদস্খলনের ভয়ে সন্তানকে দূরে কোথাও যেতে না দেওয়াটা অবশ্যই শরিয়তসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য (কারণ)। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন সত্যিই যদি হয়, তাহলে বাবা-মা সন্তানকে সেই অনুমতি দেবে। উন্নত ও সুষ্ঠু পরিবেশে সন্তান যেন জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর ফলে শিশুটি উন্নত প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি উদ্ভাসিত হবে।

উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সন্তানের প্রতিভা উদ্ভাবন করা। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব আগ্রহের একটি জায়গা আছে। এই আগ্রহের জায়গাতেই তার প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। বাবা-মা যদি সন্তানের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পায়, তাহলে তা বিকাশে সহায়তা করতে হবে। মহান আল্লাহর রহমতে বাবা-মায়ের এই সহায়তা আর অন্য কোনো সহায়তার

সমতুল্য হবে না।

আনুমানিক ১৩ বছর বয়সে প্রতিটি শিশুর ঝোঁক থাকে প্রতিভা প্রদর্শনের প্রতি। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সে তার আগ্রহ প্রকাশ করে। অন্যান্য সব বিষয়ের তুলনায় শিশুটি নিজের আগ্রহের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়। এ সময়ে সন্তানের মেধা-বিকাশে বাবা-মায়ের সহায়তা কাম্য। বর্তমানে কোন বিষয়ের প্রতি সন্তানের আগ্রহ আছে, সেটা অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিস নয়। বরং ভবিষ্যতে তার এই আগ্রহ কোন অবস্থানে গিয়ে ঠেকবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কথায় আছে, একজন অযোগ্য ডাক্তারের থেকে একজন দক্ষ নার্স উত্তম। একইভাবে ১০ জন অদক্ষ প্রকৌশলী থেকে অবশ্যই একজন চৌকশ পরিদর্শক উত্তম ।

কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহী সন্তান অবশ্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। সন্তানকে তার পছন্দের বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার জন্য বাবা-মায়ের উচিত সব ধরনের সহায়তা করা।

বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের জন্য ভালো শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। একজন ভালো শিক্ষক ভালো দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। বাবা তার সন্তানের আগ্রহের বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে সন্তান অনুপ্রাণিত হবে এবং তার আগ্রহ বাড়বে। প্রতিভা হলো সন্তানের ওপর মহান আল্লাহর অশেষ রহমত। এই প্রতিভার আবিষ্কার ও বিকাশ করতে সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা বাবা-মা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। কারণ, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব বিষয়ে যত্নশীল হয় না।

সুখী পরিবার গড়তে হলে...

আমাদের জীবনের প্রধান দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে ভালো কাজের প্রচারণা করা এবং মানুষের প্রতি সদয় থাকা। এই মহান দায়িত্বগুলো পালন করতে হলে আমাদের সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

ক্ষুধার্ত, রাগান্বিত ও ক্লান্ত অবস্থায় থাকলে কেউ শান্ত হয়ে, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে পারবে না। এমনকি এই অবস্থায় অন্যসব সাধারণ ভালো কাজেও নিজেকে লিপ্ত করতে পারবে না। যেমন : আত্মীয়স্বজন,

পাড়াপ্রতিবেশী ও সহকর্মীদের সাথে সামান্য মানিয়ে নিয়েও কাজ করতে পারবে না।

একইভাবে একটি পরিবার যদি সঠিকভাবে পরিচালনার অভাবে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে ওই পরিবার সমাজসংস্কার ও পরিবর্তনেও কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। তাই দৃঢ়ভাবে একটা বিষয় বলা যায়, কোনো মুসলিম পরিবার কখনো সঠিক ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়া সফল হতে পারে না।

বাড়ির পরিবেশ সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, এমন কিছু মৌলিক বিষয় নিচে দেওয়া হলো—

» মানুষের রিজিক মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তবু জীবনধারণের জন্য জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। একজন মানুষের জন্য যা যা বরাদ্দ আছে, তার বাইরে কোনো কিছুই সে অর্জন করতে পারবে না। মহান আল্লাহর অনুমতি নেই, এমন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। জীবনধারণের জন্য কোনো বিতর্কিত পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে জানিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি তার সুনির্ধারিত রিযিক লাভ করার আগ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব আল্লাহকে ভয় করো। কোন উপায়ে জীবনধারণ করতে চাও, তা নির্ধারণ করো। আর দারিদ্র্যের কারণে অবৈধ পন্থায় জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা কোরো না। কারণ মহান আল্লাহর কাছে যা আছে, যারা তাঁর অনুগত, কেবল তারাই সেটা অর্জন করতে পারবে।'[১]

» আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমাদের সমুদয় সম্পদ, আমরা এবং সকল সৃষ্টি একমাত্র মহান আল্লাহর অধীনস্থ। আল্লাহ সবকিছুর মালিক। আমরা তাঁরই নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামের বিধিবিধান মেনে জীবনযাপন করব। নিজের হাত কেটে ফেলার অনুমতি যেমন নেই, তেমনি টাকার অপচয় করে ব্যয়বহুল জীবনযাপনের অনুমতিও আমাদের দেওয়া হয়নি।

---

[১] *শারহুস সুন্নাহ* : ৪১১২; *শুআবুল ঈমান, বায়হাকি* : ১১৩৮